৭.২ বসুন্ধরা

'সোনারতরী' কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা 'বসুন্ধরা'। আলোচ্য কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মর্তপৃথিবীর প্রতি গভীর ভালোবাসার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মাটির প্রতি দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় আকর্ষণ, মর্ত পৃথিবীর জল, হাওয়া, তৃণ-গুল্মলতার প্রতি তীব্র আসক্তি, রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবির বাল্যকালে যে প্রকৃতি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জানালার গরাদের ফাঁকফোকর দিয়ে ইসারায় কবিতে ডাকত কিন্তু কাছে পেত না ; সেই প্রকৃতিকেই কবি মুক্ত চিত্তে আলিঙ্গান করলেন শিলাইদহে পৌঁছিয়ে 'সোনার তরীর' অসামান্য কবিতাগুলি তাই এক অর্থে শিলাইদহের প্রকৃতির দান। একদা গরাদে বন্ধ কবির মুক্ত প্রকৃতির প্রতি প্রণয়ের আকর্ষণ প্রবল থাকা সত্ত্বেও যা মিলনে পর্যবসিত হওয়া সম্ভব ছিল না, জীবনের পরিণত পর্বে শিলাইদহের সেই গ্রাম্য প্রকৃতির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আস্বাদ করে কবি প্রাণ তৃপ্ত হল। সেই প্রশান্ত প্রাণে কবি সুন্দরী প্রকৃতির যে বর্ণনা দিলেন তা 'ছিন্নপত্রাবলী'র পৃষ্ঠা থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে :

'ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন
ভালোবাসি ! ওর এই গাছপালা, নদী, মাঠ, কোলাহল,
নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা, সমস্তটা সুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।'

প্রকৃতির প্রতি এই ভালোবাসা, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে নিজেকে প্রসারিত করে দেবার আকাঙ্ক্ষাই ঘোষিত হয়েছে 'বসুন্ধরা' কবিতায়। বসুন্ধরার সঙ্গে কবির জননী সন্তানের সম্পর্ক। জননী বসুন্ধরার ক্রোড়ে কবি ফিরে যেতে চেয়েছেন, অনুভব করেছেন তার সঙ্গে নাড়ির যোগ। বসুন্ধরার সঙ্গে কবির পরিচয় জন্ম-জন্মান্তরের। জননী বসুন্ধরার উদ্দেশে কবি তাই বললেন—

আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,

কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে।'

সৌন্দর্যপিপাসু কবি জীবনের সংকীর্ণ প্রাচীর ভেঙে, নিরানন্দ অন্ধ কারাগার ভেদ করে তৃণ গুল্মপত্রের সরস জীবন রসে মিশে যেতে চেয়েছেন, স্পর্শ করতে চেয়েছেন 'শস্যক্ষেত্রতল'। মহাসিন্ধুর তীরে তীরে কবি-মন নৃত্যে সংগীতে হিল্লোল তুলতে চাইছে।

কবি কল্পনার সাহায্যে উদ্দাম-উন্মুক্ত প্রকৃতি প্রান্তরে গেছেন, প্রকৃতির উদার প্রবাহের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর বদ্ধ হৃদয় দেশ-দেশান্তরের পানে ছুটে যেতে চেয়েছে। কবি গৃহকোণে বসে লুব্ধ চিত্তে কৌতূহল বশে অধ্যয়ন করেছেন সেই সমস্ত মানুষের কথা যারা দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে ফিরেছেন একদা, কবি যেন তাদেরই সঙ্গে মনে মনে কল্পনার জাল বুনে এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাত্রা করেছেন। মহাপিপাসার রঙ্গভূমি সেই দুর্গম প্রদেশের পথহীন, তরুহীন সীমাহীন প্রান্তরের ধূলিশয্যার উপর কবি জ্বরাতুরা, শুষ্ককণ্ঠ, একাকী বসুন্ধরাকে যেন পড়ে থাকতে দেখলেন। অথচ কবি বাতায়নে বসে বসে এতদিন বসুন্ধরার যে ছবি এঁকেছিলেন সেখানে স্ফটিক স্বচ্ছ নীলাকাশ, নীল সরোবর, শৈলমালা, মেঘখণ্ড বসুন্ধরাকে যেন শিশুর মতো আঁকড়ে ছিল। নীল গিরিপর্বতমালার হিমরেখা যেন স্বর্গভেদ করে পৌঁছিয়েছে যোগমগ্ন মহাদেবের তপোবন দ্বারে। কবি মানসভ্রমণ করেছেন সুদূর সিন্ধুপারে, যেখানে ধরণি অনন্ত কুমারী ব্রত ধারণ করে, হিমবস্ত্রে আভরণহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যেখানে 'অনন্ত আকাশে/অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত / শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।' কবি মন পর্বতসংকটে একখানা ছোট্টগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখানে নদীর তীরে পড়ে আছে জাল, তরী ভাসছে জলে, জেলে ধরছে মাছ ; আর গিরির মাঝ দিয়ে চলেছে নদী। কবির ইচ্ছে করে সুখাচ্ছন্ন সেই গৃহগুলিকে বাহুপাশে আঁকড়ে ধরতে। দুর্দম আরব সন্তান হয়ে স্বাধীনভাবে মরুতে মরুতে বিচরণ করতে ইচ্ছে করে কবির, স্বজাতি হয়ে সবার সঙ্গে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে সাধ হয় তাঁর। তিব্বত, পারসিক, প্রাচীন, চীন, জাপান....যেখানে নেই কোনো ধর্মাধর্ম, নেই প্রথা, নেই দ্বন্দ্ব, যেখানে আপন-পর ভেদ নেই, যেখানে 'উন্মুখ জীবনস্রোত বহে দিনরাত', যেখানে 'বৃথাক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে/ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়/বর্তমান তরঙ্গের চূড়ার চূড়ায়/নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি'...সেই সতেজ, নির্ভীক, শিষ্টাচার দেশে জন্ম নিতে ইচ্ছা করে কবির ; সে জীবন উচ্ছৃঙ্খল হলেও কবি তাকেই ভালোবাসেন।

কবি-প্রাণ সব সময়ই সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। নগরকলকাতার বাসিন্দা কবি যখন পরিচিত শহর ছেড়ে শিলাইদহের প্রান্তরে এসে প্রকৃতির নিষ্কলঙ্ক রূপ পরিদর্শন করলেন তখন এতদিনকার অভ্যস্ত প্রতিবেশ, সেখানকার মানুষ, দৈনন্দিন জীবন সবই কবির কাছে তুচ্ছ হয়ে ধরা পড়ল। প্রকৃতি জননী কত উদার, কত সুন্দর, কত নির্মল তা কবি প্রত্যক্ষ করলেন এবং প্রকৃতির সেই স্নেহময়ীরূপ দেখেই কবি ঘুম ভেঙে 'সোনার তরী'তে উঠে বসলেন, আহ্বান করলেন মানসসুন্দরীকে, আর ব্যাকুলকণ্ঠে জননী বসুন্ধরার উদ্দেশে বললেন : 'আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে'। শূন্য প্রকৃতি প্রান্তর কবিকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে গেল মহাজ্যোতিষ্কের পথে এই নক্ষত্রের দেশে।

'বসুন্ধরা' কবিতাটি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রীতির একটি বড় পরিচয়। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত ও মিশ্রিত করে দিয়ে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের প্রতিটি অবস্থার সৌন্দর্য ও রস পান করবার জন্য কবি আকুল হয়েছেন। নিখিলের বিচিত্র আনন্দ কবি সকলের সঙ্গে এক হয়ে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে এক-আত্মা, এক-দেহ হয়ে জীবনের অন্তহীন রসোপলব্ধির পিপাসা মেটাতে উৎসুক। তিনি কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, তরু-লতা হয়ে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে ধরিত্রীর স্তনসুধা পানের জন্য ব্যাকুল। তিনি জানেন

একই প্রাণ জড়জগৎ, প্রাণীজগতের মধ্যে দিয়ে বিকাশের স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। এখানকার নদী-গিরি-সমুদ্র-আকাশের সৌন্দর্য ও সংগীত কবির মনকে আনন্দে মাতোয়ারা করে। কবি তাঁর এই আবেগময় অনুভূতিকে কাব্যের ঐশ্বর্য দান করেছেন। এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মা বোধের মূল প্রেরণা। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা হওয়াতেই কবি-প্রাণের পরম শান্তি—'বসুন্ধরা' কবিতায় তারই প্রকাশ।